# বিভক্তির সাত কাহন-৯
## ভজন সরকার

সুরঞ্জনার কথা আর শেষ হয় না সেদিন । আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টেলিফোন নিয়ে কাড়াকাড়ি । কে কতক্ষন কথা বলবে ওর সাথে । মাঝখানে ছোট্ট নদী ''ডেট্রয়েট রিভার ''- ঢিল ছুঁড়লেই ছোঁয়া যায় এমন এর দূরত্ব। ওপারেই থাকে আমাদের এক পরম সুহৃদ সুরঞ্জনা। স্মৃতির পর স্মৃতির সাজালে তৈরী হবে এক মস্ত পাহাড় - সেখানে আমরা দুজন আর আমাদের সুরঞ্জনা । মানুষের সম্পর্ক বড় বিচিত্র-কখন কে আপন থেকে নিমিষেই হয়ে যায় পর । আবার কেউ সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড় হয়ে কখন ঢুকে পরে মনের অলিন্দে । অলিন্দে ঢু মারা সুরঞ্জনার সাথে হাজারো কথা আমার স্ত্রীর - কত হাজারো স্মৃতি- জীবনের সব থেকে বড় যে সিদ্ধান্ত বিয়ে সেখানেও মেয়ে পক্ষের এক মাত্র প্রতিনিধি সে । কথার অফুরন্ত ঢেউ যেন আমাদের টেলিফোনে সে দিন ।

অস্বাভাবিক স্বল্পভাষিনী এ বধুঁকে নিয়ে আমার হাজারো বিড়ম্বনা । কেউ ভাবে অসামাজিক , কেউ ভাবে দাম্ভিক, কেউ আবার মেশার যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে । টেলিফোনে বাড়তি কথা বলাতে তার আরও আপত্তি । ব্যতিক্রম একমাত্র আমার বাবা । শ্বশুড়-পুত্র বধুর কথকতা যেনো আর ফুরায় না । আমার সাথে সৌজন্যমূলক কথা-বার্তার পরই বাবার গম্ভীর কন্ঠ '' বৌমাকে দে ।'' অভ্যস্থ আমি - বৌকে পাশে বসিয়েই বাবাকে ফোন করি । সেই বঁধু আমার আজ কথার ডালা সাজিয়েছে যেনো ।

প্রথম দিনেই মনের ভেতর এক অজানা আশঙ্কা বাসা বেঁধে বসলো আমাদের। সুরঞ্জনা ওর টেলিফোন নম্বর দিলো না কেন ? আমরা-ই হয়ত ভুলে গেছি চাইতে । না, আমরা তো কয়েক বার চেয়েছিলাম - ভাবলাম দুজনেই । সপ্রতিভ মেয়েটি অসম্ভব চতুরতায় কাটিয়ে গেছে প্রসংগটি । কি এমন থাকতে পারে যে টেলিফোন নম্বরটিও জানানো যাবে না? আমরা আবার হাতড়াতে থাকি পুরানো স্মৃতি- প্রায় বহু বছর আগের সুরঞ্জনাকে মনে পড়ে । সাথে আমেরিকা প্রবাসী বর । মাঝ বয়সের ভদ্রলোক ভীষন আশাবাদি আমেরিকা নিয়ে -আমেরিকায় ইসলামের সমস্ত গৌরব গাঁথা এক নিশ্বাসে বলে যান - স্বপ্ন দেখেন আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবী মুসলমানেরা ডমিনেট করবে । ভাবি, এই ৯/১১ এর পর কেমন আছেন ভদ্রলোক - আজও কি তার স্বপ্ন অটুট আর অক্ষত আছে তেমনি ?

আবার ব্যস্ত হয়ে পরি আমরা। আবার কোথায় যেনো ডুব মারে সুরঞ্জনা । নিজেদের মূর্খতাকে ভীষন পীড়া দেয় আমাদের। কেন রাখলাম না টেলিফোন নম্বরটি জোর করেই । নিজেদের মধ্যে আবার আলাপ করি । একবারের জন্যেও কি জানতে চেয়েছিলাম কেমন আছে সুরঞ্জনা । সারাক্ষন শুধু আমাদের কথাই বলে গেছি আমরা । এ সমস্ত ভেবে ভেবে আবার ভুলে যাই- প্রবাস জীবনের টানাপোড়েন ভুলিয়ে দেয় সব। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি পড়ালেখা নিয়ে । স্ত্রী ব্যস্ত আমাদের বহু-কাংখিত প্রথম সন্তান ঈশানুর জন্ম-পূর্ব জটিলতা সামাল দিতে । বার কয়েক টিউবিক্যাল প্রেগনেনসির পর এই প্রথম সম্ভাবনা । তারপর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ডায়াবেটিসের জাঁকিয়ে ধরা সন্তান ধারণের দু'মাস কাল থেকেই । আত্মীয়-স্বজনহীন এ বিরান প্রবাসে প্রতিদিন নয়বার করে শরীরে সুঁই ফোঁটানোর যন্ত্রণায় অতিষ্ট আমার স্ত্রী সুরঞ্জনাকে মনে করে - বিরক্ত হয় সুরঞ্জনার উপর । এত কাছে তেকেও——

হঠাৎ খবর আসে সুরঞ্জনার । খবর না বলে দুঃসংবাদ বলাই ভাল । ওরই এক বান্ধবী বলে সব - এই দীর্ঘ সময়ে সুরঞ্জনার সমস্ত কাহিনী । প্রথম রাতের বিড়াল মারার মতই আমেরিকায় পা রাখতেই সুরঞ্জনাকে বাধ্য করা হয় বোরখা পরতে । পুরানো সমস্ত যোগাযোগের মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সুকৌশলে । পুরুষ বন্ধু দূরে থাক কোন বেনামাজি নারীর সাথেও কথা বলা নিষিদ্ধ তার । এক অনভ্যস্থপরিবেশে মানিয়ে নেয় নিজেকে । জীবনে একবার বিদ্রোহ করলেও এবার আর বিদ্রোহ করে না সুরঞ্জনা । মেনে নেয় নিজের পরিনতিকে ভাগ্য বলে । বসবাস করে এক পরিবেশে যেখানে অন্য-ধর্মের মানুষ মাত্রই কাফের - যেখানে নারী শুধুই সামনে যাবে নারীর কিংবা স্বামী-সন্তানসহ ধর্ম-নির্ধারিত কিছু পুরুষের । সুরঞ্জনা আর শোনে না মৌসুমী ভৌমিকের গান - আর আবৃত্তি করে না প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা - শানিত যুক্তিতে মাতিয়ে তোলে না কোন আসর ।

সুরঞ্জনার উপর থেকে অভিমান মুছে ফেলি আমরা । সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উপর বিশ্বাসহীন আমাদের কাছ থেকে সুরঞ্জনার বর্তমান দূরত্ব মাপতে চেষ্টা করি । মাঝখানের ঢিল ছোঁড়া ছোট্ট নদী ''ডেট্রয়েট রিভার ''-কে মনে হয় কোন এক মহাসাগর - যা পার হয়ে সুরঞ্জনা আমাদের কাছে পৌঁছাবে না আর কোন দিন । (চলবে)

।। জুন ,২০০৬, কানাডা ।।